নিটওয়ার শিল্প

ধ্বংসের উদ্যোগ!

দেশের রপ্তানি আয়ের ২৪ শতাংশের যোগানদার নিট শিল্পকে ধ্বংসের পর্যাপ্ত পদক্ষেপই নিয়েছে সরকার। স্থলপথে সুতা আমদানি বন্ধ ও নগদ সহায়তা অর্থ আটকসহ একাধিক নেতিবাচক সরকারি সিদ্ধান্তে অস্তিত্ব বজায় রাখতে নিট শিল্প মালিক-শ্রমিকরা নেমে এসেছেন রাজপথে... লিখেছেন আসজাদুল কিবরিয়া

দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস তৈরি পোশাক খাতের উৎপাদক ও রপ্তানিকারকরা এখন রাজপথে অবস্থান নিয়েছেন। তৈরি পোশাকখাতের প্রতি সরকারের একরকম বিমাতাসুলভ আচরণ তাদেরকে এই দিকে ঠেলে দিয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। বিশেষ করে গত কয়েক মাসে পোশাকখাতের জন্য সহায়ক নয় এমন একাধিক সিদ্ধান্তে এই শিল্প মালিক-শ্রমিকরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। গত বছর সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা ও এর জের ধরে আফগান যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বিশ্বমন্দায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তৈরি পোশাকখাত। বিশ্বমন্দার ধাক্কা সামলানোর সুযোগ না দিয়ে সরকার সম্প্রতিকালে একাধিক বিতর্কিত সিদ্ধান্তে এই খাতকে সংকটের দিয়ে ঠেলে দিয়েছে। বিশেষ করে নিট গার্মেন্টসের ভবিষ্যৎ ভীষণ রকম অনিশ্চিত হয়ে গেছে। অথচ দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ২৪ শতাংশের যোগানদার নিটওয়্যার খাত। বিদায়ী অর্থ বছরের নিটওয়্যারের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করতে হয়েছে। গত ১০ বছরের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা এবারই প্রথম। রপ্তানিকারকরা মনে করছেন, বিশ্বমন্দার পাশাপাশি স্থলপথে সুতা আমদানি বন্ধ করে দেয়ায় এই পরিস্থিতি হয়েছে। তার ওপর যোগ হয়েছে নগদ সহায়তা অর্থ পরিশোধ না করাসহ আরো সমস্যা।

স্থলপথে সুতা আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা

সংকটটা মারাত্মক আকার ধারণ করে কয়েক মাসে আগে হঠাৎ করে সরকার যখন স্থলপথে সুতা আমদানি বন্ধের নির্দেশ জারি করে। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর এবং বিমান বন্দর ছাড়া সকল শুল্ক বন্দর দিয়ে সুতা আমদানি নিষিদ্ধ করা হয় এই অজুহাতে যে এতে প্রচুর চোরাই সুতা আসে যা গার্মেন্টসে না গিয়ে খোলা বাজারে কম দামে বিক্রি হচ্ছে। আর এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশীয় সুতা শিল্প।

কিন্তু নিট শিল্প উদ্যোক্তারা বলেছেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে নিট গার্মেন্টস শিল্প দেশের স্পিনিং মিলগুলোর কাছে এক প্রকার জিম্মি হয়ে পড়ছে। স্পিনাররা একচেটিয়াভাবে সুতার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে।

নিট শিল্প উদ্যোক্তারা আরো জানান, দেশীয় সুতা ব্যবহারে তাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের নামে একতরফাভাবে স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানি বন্ধ করে দেয়া মোটেও উচিত হয়নি। তাঁরা বলেন, রপ্তানিমুখী নিট পোশাক শিল্পের জন্য ব্যাক টু ব্যাক এলসির আওতায় ভারত থেকে শুল্কমুক্তভাবে সুতা আমদানি করা হয়। কাজেই এর সঙ্গে চোরাচালানের কোনো সম্পর্ক নেই। চোরাচালানের সঙ্গে বাণিজ্যিকভিত্তিতে সুতা আমদানির সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে। সুতরাং প্রয়োজন মনে হলে স্থলবন্দর দিয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সুতা আমদানি নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) সভাপতি মঞ্জুরুল হক সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, ‘ আমরা তো দেশী মিল থেকেও সুতা কিনছি। কিন্তু তাঁরা আমাদের হাত-পা বাঁধতে চাইছেন কেন?’ তিনি বলেন, বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে অতি উন্নতমানের তুলার দাম প্রতি পাউন্ড ৪৮ সেন্ট। সে হিসেবে বাংলাদেশে ১ কেজি সুতা উৎপাদন খরচ কোনোভাবেই ১.২৭ ডলারের বেশি হতে পারে না। অথচ দেশীয় স্পিনিং মিল মালিকরা সবসময়ই ভারতীয় সুতার দামের সঙ্গে ২৫% নগদ সহায়তার অর্থ যোগ করে তাদের উৎপাদন খরচ দেখান। মঞ্জুরুল হক আরো বলেন, ‘ভারত থেকে স্থলপথে সুতা আমদানি বন্ধ করায় বহু গার্মেন্টস সময়মতো সুতা না পেয়ে কাজ করতে পারছে না। দেশীয় সুতা উৎপাদকরা চাহিদামাফিক সুতা যোগান দিতে সক্ষম বলে দাবি করলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন হচ্ছে না।’

জানা গেছে, বর্তমানে প্রতি কেজি বাংলাদেশী কার্ডেড সুতার দাম ভারতীয়

কার্ডেড সুতার চেয়ে গড়ে ৫০ থেকে ৬০ সেন্ট বেশি। আবার ভারতীয় কম্বড সুতার চেয়ে বাংলাদেশী কম্বড সুতার দাম গড়ে কেজি প্রতি ৭৫ থেকে ৯০ সেন্ট বেশি। সুতা আমদানির বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বায়ারগণ সাধারণত সর্বনিম্ন আমদানি খরচ ও সর্বনিম্ন লিড টাইম বিবেচনা করে রপ্তানি আদেশ প্রদান করে। বাংলাদেশের ৩০/১ কার্ডেড ধরনের ১ কেজি সুতার মূল্য যেখানে ২.৩০ ডলার, ভারতে এ পরিমাণ সুতার দাম ১.৭৫ ডলার। ৩০/১ কমবেড ধরনের বাংলাদেশের সুতার দামও ৮০ সেন্ট বেশি। দেশীয় মিলে উৎপাদিত সুতার দাম একক প্রতি ৩০-৩৫% বেশি।সমুদ্র পথে সুতা আমদানি করতে হলে পূর্বের ৭/৮ দিনের পরিবর্তে ২৮/৩০ দিন প্রয়োজন। তাছাড়া ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সরাসরি সমুদ্র রুট প্রচলিত নেই। আমদানি খরচ ও প্রতি কেজি সুতার জন্যে গড়ে ১০ সেন্ট বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া সমুদ্র পথে সুতা আমদানি করতে হলে ১৭ হাজার কেজি ধারণ সম্পন্ন একটি পূর্ণ কন্টেইনার ভাড়া করতে হয়। কিন্তু এলসি'র বিপরীতে মাত্র ২/৩ হা: কেজি সুতার জন্যও সমপরিমাণ খরচ পড়বে। অন্যদিকে বন্দরের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক গ্রহণে যে সময়ের প্রয়োজন এবং বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা ও জটিলতার কারণে লিড টাইম আরো বৃদ্ধি পাবে। দেশীয় স্পিনিং মিলে কিছু কিছু কাউন্টের সুতা উৎপাদন করতে পারে না। যেমন ডাইড মিলঞ্জ সিভিসি সুতা। তাছাড়া ইতিমধ্যে স্থলপথে সুতা আমদানির ওপর নির্ভর করে নীট ওয়্যার ও টেরিটাওয়েল শিল্পে ৮০০ কারখানা গড়ে উঠেছে। এতে বিনিয়োগ হয় ৫,৫০০ কোটি টাকা। ২.৫ লাখ নারী শ্রমিকসহ উক্ত কারখানাগুলোর ৪ লাখ শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। স্থল পথে সুতা আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা না হলে এ সকল কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে

নিটওয়্যার শিল্পের প্রধান কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জের একাধিক নিট গার্মেন্টস ঘুরে এবং উৎপাদক-রপ্তানিকারকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বেশিরভাগ গার্মেন্টসেই স্বল্প ও মাঝারি পুঁজির বিনিয়োগ রয়েছে। ফলে শুধু সমুদ্র পথে তাদের পক্ষে অল্প পরিমাণ সুতা আমদানি করা সম্ভব হবে না। এসব উদ্যোক্তারা জানান, তারা ছোট ছোট এলসির বিপরীতে একেক চালানে ৩/ ৪ হাজার কেজি সুতা আনেন। স্থলপথে এগুলো আনতে কোনো সমস্যাই হয় না। অথচ জাহাজে আনতে গেলে একটি পূর্ণ কনটেইনার ভাড়া করতে হবে। আর একটি পূর্ণ কনটেইনারে ১৭ হাজার কেজি সুতা আমদানি করা হয়। এই অবস্থায় সুতা আমদানির খরচ অনেক বেড়ে যাবে। এতে উৎপাদন খরচও বাড়বে

তাঁরা আরো বলেন, আমরা পোশাক তৈরি করি আমদানিকারদের চাহিদানুযায়ী অথচ স্পিনিং মিলগুলো তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সুতা বিক্রি করতে চান।

গলার ফাঁস নগদ সহায়তা

বিগত প্রায় এক বছর সময় ধরে সরকার নগদ সহায়তার টাকা ছাড় করছে না। আবার নগদ সহায়তার বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো রপ্তানিকারকদের কোনো ঋণ দিচ্ছে না। অন্যদিকে নগদ সহায়তার হার পরিবর্তন করা হয়েছে। আর এ নিয়ে ত্রিশঙ্কু জটিলতায় উদ্যোক্তা-রপ্তানিকারকরা এখন দিশেহারা হয়ে গেছেন।

জানা গেছে, বস্ত্রখাতের রপ্তানিকারকরা রপ্তানি প্রত্যাবাসন হওয়ার আগ পর্যন্ত সরকারের দেওয়া নগদ সহায়তা পান না। এমনকি অনেকক্ষেত্রে প্রত্যাবাসিত হওয়ার অনেক পরে রপ্তানিমূল্যের ২৫% নগদ সহায়তার অর্থ ছাড় করা হয়। এই অবস্থায় রপ্তানিকারকরা রপ্তানি প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে প্রাপ্তব্য নগদ সহায়তার ৮০% পর্যন্ত ঋণ নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতেন।

কিন্তু অতিসম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে নিরীক্ষক নিয়োগের নির্দেশ জারি করেছে। এই নির্দেশে বলা হয়েছে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বকেয়া নগদ সহায়তা পেতে হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়োজিত অডিট ফার্ম দ্বারা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসাব নিরীক্ষা করতে হবে। অডিট ছাড়া কোনো নগদ সহায়তার অর্থ ছাড় করা যাবে না বলে বাংলাদেশ ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে। বর্তমানে গার্মেন্টস কারখানাগুলো ৪০০ কোটি টাকার নগদ সহায়তা থেকে বঞ্চিত।

এদিকে নগদ সহায়তার হার ২৫% থেকে ১৫%-এ নিয়ে আসায় এটির বাস্তবায়ন নিয়েও জটিলতা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এক নির্দেশে ৯ মে এবং তার পর থেকে জাহাজিকরণের বেলায় নগদ সহায়তার হার ১৫% হবে বলে সার্কুলার জারি করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এই নির্দেশের জের ধরে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নগদ সহায়তার বিপরীতে রপ্তানিকারকদের কোনো অগ্রিম না দেয়ার জন্য তাদের শাখাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত এক ব্যাংকের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা বলেন, সরকার নগদ সহায়তার হার কমিয়ে দিয়েছে এবং একই সঙ্গে অডিট করার আগ পর্যন্ত নগদ সহায়তা না দেওয়ার ঘোষণা করেছে। এ কারণে নতুন হারে নগদ সহায়তা ও অডিট করার আগে যেহেতু টাকা দেওয়া যাবে না সেই বিবেচনায় আপাতত আমরা এর বিপরীতে অগ্রিম না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এদিকে রপ্তানিকারকদের নগদ সহায়তার প্রায় ৬ শ' কোটি টাকা আটকে থাকার পাশাপাশি এর বিপরীতে কোনো ব্যাংক ঋণ না পাওয়ায় তারা বড় ধরনের আর্থিক সংকটে পড়েছেন। ওভেন ও নিট গার্মেন্টস রপ্তানিকারকরা অভিযোগ করে বলেছেন, সরকার এভাবে প্রকারান্তরে রপ্তানিকারদের হয়রানি করছে। তারা আরো অভিযোগ করেছেন, ক্যাশ ইনসেনটিভ নিয়ে তাদেরকে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে। তাঁরা বলেন, আমরা স্থানীয় মিল থেকে আন্তর্জাতিক মূল্যের চেয়ে প্রতি কেজি সুতা ৭০/৮০ সেন্ট বেশি দরে ক্রয় করি। আর এজন্য আমাদের ক্যাশ ইনসেনটিভ দেয়া হয়। আসলে তো এটা উচ্চমূল্যে দেশীয় সুতা ক্রয়ের জন্য সরকারে ভর্তুকি। এ প্রসঙ্গে মঞ্জুরুল হক বলেন, ' দেশী মিলকে সুতা সরবরাহের ৩৬ ঘন্টার মধ্যে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। অথচ নগদ সহায়তার টাকা পেতে রপ্তানিকারদের ৬/৭ মাস সময় লেগে যায়। আমরা এই হয়রানির অবসান চাই।'

নিট শিল্প মালিকরা নগদ সহায়তার হার কমিয়ে ১৫% করারও প্রতিবাদ জানিয়ে এটিকে আগের মতো ২৫% বহাল রাখার দাবি জানান। তাঁরা বকেয়া নগদ বিকল্প সহায়তার অর্থ ছাড় না করা পর্যন্ত রপ্তানিমুখী বস্ত্রখাতের সকল প্রতিষ্ঠানের গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন বিল অপরিশোধিত থাকলে এসবের সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করারও দাবি করেন।

রাজপথে সমাবেশ ও কালো পতাকা

নিট পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)-এর সঙ্গে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজেএমইএ) এবং বাংলাদেশ টেরিটাওয়েল ও লিনেন ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স

রপ্তানি আয়ের প্রবণতা

অর্থবছর	নিট (কোটি ডলারে)	টেরি টাওয়েল (কোটি ডলারে)
১৯৯২-৯৩	২০.৪৫	১.৭২
১৯৯৩-৯৪	২৬.৪১	২.০০
১৯৯৪-৯৫	৩৯.৩২	২.৮৩
১৯৯৫-৯৬	৫৯.৮৩	২.৭০
১৯৯৬-৯৭	৭৬.৩০	৩.৯৪
১৯৯৭-৯৮	৯৪.০	৩.৪৫
১৯৯৮-৯৯	১০৩.৫৩	৫.০২
১৯৯৯-২০০০	১২৬.৯৮	৫.১৭
২০০০-০১	১৪৯.৬২	৫.০৯

এসোসিয়েশন (বিটিটিএলএমইএ)-এর অধিভুক্ত নিট শিল্প উদ্যোক্তারা যৌথভাবে এই শিল্পের সমস্যা সমাধানে সরকারে ওপর চাপ তৈরি করতে অবস্থান ধর্মঘট ও কালো পতাকা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে বিএসটিএমপিএ। গত ১৫ জুন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সাভার ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে মালিক-শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে এ অবস্থান ধর্মঘটে অবস্থান নেন। এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জের সমাবেশে প্রায় ৭৫ হাজার লোক অংশ নেন। নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ায় বঙ্গবন্ধু সড়কের ওপর বিকেএমইএ কার্যালয়ের সামনে সকাল থেকে হাজার হাজার নিট শ্রমিক-কর্মচারীরা সমবেত হন। এদের বেশিরভাগই ছিল নারী শ্রমিক। নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটি বিসিক শিল্প নগরীসহ আশপাশের এলাকায় দেশের সবচে' বেশি ও বড় বড় নিট কারখানা অবস্থিত। এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকদের নেতৃত্বে শ্রমিক-কর্মচারীরা সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বৃষ্টির মধ্যে ৭ দফা দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করেন। সমাবেশে ৩০ জুনের মধ্যে নিট শিল্পের সমস্যা সমাধানে ৭ দফা দাবি মেনে নিতে সরকারের প্রতি আহবান জানানো হলেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এর ফলে গত ৯ জুলাই জাতীয় প্রেসক্লাবে কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচিতে নিট পোশাক খাতের মালিক, কর্মচারী ও শ্রমিকদের কালো ব্যাজ ধারন, কারখানায় কালো পতাকা উত্তোলন ও দাবি সংবলিত ব্যানার এবং মালিকের গাড়িতে কালো পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া রোববার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত গণঅনশন হবে। এরপর ঢাকায় মহাসমাবেশের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

নেপথ্যে কারা?

নিট শিল্পের এই সংকটের নেপথ্যে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ)-এর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সক্রিয়তা কার্যকর হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিটিএমএ দাবি করেছে, তারা পোশাক খাতের প্রয়োজনীয় পরিমাণ সুতার যোগান দিতে সক্ষম। প্রশ্ন হলো এতোদিন ধরে সুতা যোগান দিতে না পারলেও হঠাৎ করে কিভাবে কয়েক মাসে তারা এতোই উৎপাদন সক্ষম হয়ে গেলেন যে গোটা গার্মেন্টস শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী সুতার যোগান দিতে পারবে? বিটিএমএ গত বছরই অভিযোগ করেছে যে ভারতীয় সুতা বাংলাদেশে ডাম্প করা হচ্ছে। তারা এন্টি ডাম্পিং মামলা করবে। ঐ বলা পর্যন্তই। তারপর আর তা এগোয়নি। বস্ত্রমন্ত্রী মতিন চৌধুরীর সঙ্গে বিশেষ যোগসাজশে স্থলপথে সুতা আমদানি বন্ধ করতে সরকারকে প্ররোচিত করায় বিটিএমএ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। বিটিএমএ অতীতে বিভিন্ন সময়ে রপ্তানিমুখী নিট শিল্পের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করেছে। ১৯৯৬ সালে জিএসপি সংকট তৈরির পেছনেও তাদের মদদ ছিল।

পরিহাসের বিষয় হলো অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান গার্মেন্টস শিল্প উদ্যোক্তাদের 'দর্জিওয়ালা' বলে বিদ্রুপ করেছেন। কিন্তু এই 'দর্জিওয়ালারাই' যে বছরে ৪৫০ কোটি ডলারের বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে সহায়তা করছে সেটা তিনি কিভাবে অস্বীকার করবেন?

গার্মেন্টস শিল্পের দুর্দিন

বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের যাত্রা শুরু ৭০-এর দশকের শেষভাগে। বর্তমানে প্রায় ৩৫০০ কারখানায় ১৬ লাখ শ্রমিক কাজ করছে। শিল্পখাতের মোট জনশক্তির এক তৃতীয়াংশ গার্মেন্টসে কর্মরত রয়েছে। ১৯৭৮ সালে প্রথম তৈরি পোশাক রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৭৬% এ খাত থেকে আসায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা অনেকাংশ নির্ভরশীল। গার্মেন্টসে কর্মরত শ্রমিকদের প্রায় ৭০% নারী। অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা রাখা এ খাতটিতে আজ চলছে নানা সংকট। গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পরে বন্ধ হয়ে গেছে প্রায় ১২০০ গার্মেন্টস। বেকার হয়ে পড়েছে ৪ লক্ষাধিক শ্রমিক। এর মধ্যে আড়াই লাখ নারী শ্রমিক রয়েছে। এদের কেউ কেউ বিপথগামী হয়েছে। কেউ কেউ বেকার হয়ে চে থাকার জন্যে অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক টিডিএ-এর আওতায় সাব-সাহারান আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ান বেসিনভুক্ত ৭২টি দেশকে কোটা ও শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান, অন্যান্য দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে পোশাক রপ্তানির আদেশ হ্রাস পেয়েছে। সম্প্রতি পাকিস্তানকে ইইউ শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান ও ১৫% কোটা বৃদ্ধি করেছে।

পাকিস্তান তৈরি পোশাক রপ্তানি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ। পাকিস্তানের লিড টাইম বাংলাদেশের তুলনায় অর্ধেক এবং দেশটির নিজস্ব পশ্চাদমুখী সংযোগ শিল্প রয়েছে। ফলে পাকিস্তানকে নতুন করে বাড়তি সুবিধা প্রদানে বাংলাদেশ অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। বর্তমানে কাটিং, মেকিং চার্জ যা পূর্বে ছিল ১৪-১৫ ডলার তা ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ৬-৭ ডলারে নেমে এসেছে। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ বস্ত্রখাত থেকে ওভেন বস্ত্রের ১৫-১৮% এবং নীট বস্ত্রের ৭০% গার্মেন্টসে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশ চীন, ভারত, পাকিস্তান থেকে ৮০% ফেব্রিক আমদানি করে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। উদ্যোক্তারা বলেছেন, গার্মেন্টস শিল্প ১১ সেপ্টেম্বরের পর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে আরো অধিক পরিমাণ রপ্তানি হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, ইইউ ভুক্ত দেশগুলো হতে কাঙ্ক্ষিত অর্ডার আসছে না। বেকার শ্রমিক ও গার্মেন্টসের জন্য একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় সরকারের এ খাতে প্রয়োজনীয় ভর্তুকী প্রদানও জরুরি।

২০০৪ সালের পর মাল্টি ফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট (এমএফএ) না থাকায় অবাধ বিশ্ব বাণিজ্যের মোকাবিলা করতে হবে বাংলাদেশকে। বিজিএমইএ-র জয়েন্ট সেক্রেটারি (প্রশাসন ও আরডিটি) মেজর (অবঃ) আতিকুল হাসান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, '২০০৪ সালের পর রপ্তানিতে কোয়ান্টিটিটিভ রেসট্রিকশন থাকবে না। তখন বস্ত্র উৎপাদনে স্বাবলম্বী দেশসমূহ তাদের ফরোয়ার্ড লিংকেজ শিল্প সম্প্রসারণে উৎসাহিত হবে। ফলে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ফেব্রিক পাওয়া যাবে না। আমরা চীন, ভারত, পাকিস্তান থেকে ৮০% ফেব্রিক আমদানি করে তৈরি পোশাক রপ্তানি করি। কিন্তু এ সকল দেশেও আমাদের মতো 'সস্তা শ্রম' সুবিধা থাকায় তারা আর ফেব্রিক রপ্তানিতে উৎসাহী হবে না।' এ সকল দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ বিদ্যমান। ভারত ২০০৪ সালের পর শিল্পবাজার মোকাবেলার জন্যে ২৫০০ কোটি রুপির একটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে যার মধ্যে ৬% সুদ ও ১০ বছর মেয়াদি ঋণ পরিশোধ সুবিধা বিদ্যমান। তাছাড়া বাংলাদেশের লিড টাইম (L/C খোলার পর মাল তৈরি করাসহ জাহাজিকরণ পর্যন্ত) প্রতিযোগী দেশসমূহের তুলনায় দ্বিগুণ। ফলে বাংলাদেশে অর্ডার কম আসবে এবং বেশি সময়ের ব্যবধানে রপ্তানি আদেশ অনুযায়ী শিপমেন্ট করতে হয়। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের ওভেন বস্ত্রের ৮০ ভাগই ভারত, চীন, হংকং, পাকিস্তান, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানি করতে হয়। ২০০৪ সালের পর টিকে থাকতে হলে তাদের টেক্সটাইল শিল্পের উন্নতি ঘটাতে হবে। তৈরি পোশাক খাতকে রক্ষা করতে পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের উন্নয়নের বিকল্প নেই। বিটিএমএ সভাপতি মতিন রহমান বলেন, '২০০৪ সালের পর কাপড় ও সুতা দেশীয় না হলে বাংলাদেশে কোনো অর্ডার আসবে না।'

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পকে টিকে থাকতে হলে রপ্তানি পণ্যের ডাইভারসিফিকেশন, নতুন বাজার সন্ধানে বিভিন্ন মেলার আয়োজন, পণ্যের গুণগতমান ও ডিজাইন উন্নয়নে মার্কেট রিসার্চ আবশ্যক। ক্রেতা নির্বাচন, রপ্তানি আদেশ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির সরবরাহকারী সহজে খুঁজে পেতে এবং উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের ২০ হাজার ক্রেতাকে বিজিএমইএ'র নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি পোর্টালে আনার জন্যে ই-কমার্সকে কাজে লাগাতে হবে।

প্রশান্ত মজুমদার শান্ত